বি দ্যা সা গ র

নতুন করে জানা
অন্যভাবে চেনা

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়

পুনশ্চ

॥ কি বই কেন বই ॥

ডিরোজিও মাথাটা না খেয়ে নিলে হয়ত বিদ্যাসাগর নিয়েই জীবন কাটাতাম। বিদ্যাসাগর। শত দুঃখে জীর্ণ বাঙালির জীবন আলো করা একটা চরিত্র। এসেছিলেন উনিশ শতকে। ফিরিঙ্গির ছেলে ডিরোজিও জন্মেছিলেন কলকাতায়। তার ঠাকুরদা মাইকেল ডিরোজিও। নাম করা পর্তুগিজ মার্চেন্ট। বাবা ফ্রান্সিস জেমস স্কট অ্যান্ড কোম্পানির বরিষ্ট হিসাবরক্ষক। মৌলালিতে পুকুর বাগানসহ ছ'বিঘে জমিতে তাদের বিশাল দোতলা বাড়ি। আর বিদ্যাসাগর জন্মগ্রহণ করেন কলকাতা থেকে ৫৬ কিলোমিটার দূরে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের পর্ণকুটিরে। ঠাকুরদা রামজয় তর্কভূষণ সংসার ত্যাগ করে বিবাগী। বাবা ঠাকুরদাস ছাপোষা সংসার সামলাতে কলকাতা এসেছেন। থাকেন বড়বাজারে জগদ্দুর্লভ সিংহের বাড়িতে আশ্রিত হয়ে। দশ টাকা মাইনের চাকরি করেন। বিদ্যাসাগর তার ছেলে। একজন ছিলেন স্কটিশ মাস্টার ডেভিড ড্রামন্ডের ছাত্র আর নিজে কলকাতার বিখ্যাত ইংরেজি ইস্কুলের মাস্টার। ইস্কুলের নাম হিন্দু কলেজ। বিদ্যাসাগর গরীব ব্রাহ্মণের সন্তান। মাইনে দিতে লাগবে না বলে ভরতি হন সংস্কৃত কলেজে। একজন পাশ্চাত্য বিদ্যার পথিক অন্যজন প্রাচ্য বিদ্যার। উনিশ শতকে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের যে বস্ত্র বয়ন হয়েছিল তাতে দু'জন দুদিক থেকে দুরকম সুতো জোগান দিয়েছিলেন—একজন টানার অন্যজন ভরণের। দু'জনের উৎসভূমি আলাদা, চলন পথও আলাদা। কিন্তু ইতিহাসের একই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছিলেন। উনিশ শতকের বঙ্গীয় রেনেসাঁসকে দু'জন দুদিক থেকে গড়ে তুলেছিলেন। কাজেই ডিরোজিও-চর্চা করেছি বলে বিদ্যাসাগর-চর্চা করতে পারব না এমন কোনো কথা নেই।

বীরসিংহের মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা সাদা-মাটা পোষাকের এক পারঙ্গম সংস্কৃত পণ্ডিত অথচ ইংরেজি-ওয়ালাদের সঙ্গে টক্কর দেবার মতো আধুনিক মন তাঁর। যেমন বিদ্বান, তেমনি কর্মশক্তি, তেমনি দরদী হৃদয়। সাহেব-সুবো, রাজা-মহারাজা থেকে আর্ত-আতুর সাধারণ মানুষ, সংসার-পীড়িত নারী থেকে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সকলেরই সমীহা আদায় করে নিয়েছেন। তাই তাকে নিয়ে বলারও অন্ত নেই, লেখারও অন্ত নেই। একটি জাতির অশেষ সৌভাগ্যে একজন বিদ্যাসাগর আসেন। রেনেসাঁসের চাবিকাঠি হচ্ছে হিউম্যানিজম—মানবতাবাদ। ইতালীয় রেনেসাঁসে অনেক সুপণ্ডিত হিউম্যানিস্ট এসেছিলেন কিন্তু শত সমালোচনায় ক্ষত-বিক্ষত হওয়া সত্ত্বেও বঙ্গীয় রেনেসাঁসের বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তুলনা দেওয়া যায় এমন কোনো হিউম্যানিস্টের সাক্ষাৎ সেখানে মেলে না। বিদ্যাসাগর বাঙালির আঁধার ঘরের মানিক। তাকে সে হারাতে চায় না। হারাতে দেওয়া যায় না।

১৮২০ সালে জন্মেছিলেন। দেখতে দেখতে দু'শো বছর এসে গেল। জন্ম দ্বিশত বর্ষ। তাকে মানুক আর না মানুক বর্ষ পালনের উদ্যোগে কোনো খামতি রাখতে রাজি নয় বাঙালি। সবাই ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। আমি আর বাকি থাকি কেন? পুরুতের টানাটানি পড়লে জিভের আড় না-ভাঙা পুরুতও মন্ত্র আওড়াতে আরম্ভ করে। আমিও অনেক মণ্ডপে বক্তৃতা করেছি সারা বছর ধরে। তবে বলা আলাদা লেখা আলাদা। কচু পাতার উপর বৃষ্টিপাত করলে দাগ থাকে না। নির্ভয়ে যত খুশি বলা যায়। বিদ্যাসাগর সম্পর্কে মোদ্দা কথা কিছু বলার ছিল। যেখানে ডাক পেয়েছি সেখানেই বলেছি সেসব কথা। তা প্রায় ৩৪/৩৫ জায়গায়। কিন্তু মেলালে সবই এক। একটাই বক্তৃতা। কিন্তু লেখায় তা চলে না। লেখা আলাদা আলাদা করতে হয়। প্রতিটি লেখায় উত্থাপন করতে হয় স্বতন্ত্র প্রসঙ্গ। যা বলা যায় নি তা জানানোর জন্যই লেখা। তাই ঠিক করেছিলুম পালনের উচ্চকিত দিবা কল্লোলে নয়, সব একটু থিতিয়ে এলে নগরগুঞ্জন ক্ষান্ত সন্ধ্যায় বসব কলম দিয়ে লেখার মালা গাঁথতে। দ্বিশত বর্ষ পেরিয়ে গেল। জোয়ারের জল নেমে গেছে। এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তাকে নিয়ে কি বলা হয়েছে, কি বলা হয়নি। যা বলা হয়নি, কম বলা হয়েছে বা তেমন করে বলা হয়নি তাই নিয়েই আমার লেখা। তাঁর জীবনের যেসব উৎসে, উৎসবে ও অবসাদে তেমন করে আলো পড়ে নি সেইসব অস্বচ্ছ, অস্পষ্ট ও অমনোযুক্ত প্রসঙ্গের মর্মভেদ করার চেষ্টা। কোথাও তথ্য দিয়ে, কোথাও বিচার দিয়ে, কোথাও বা অনুভব দিয়ে। কখনো মনোযোগ সম্পাত করেছি প্রেক্ষিতে, কখনো তৌলন পরিপার্শ্বে, কখনো বা তৌলন আলোচনায়। আশ্রয় নিয়েছি তথ্যগত

ভ্রামণিকতা ও তথ্যগত অন্তর্বীক্ষণ দুরকম প্রক্রিয়ারই। যে পথ দিয়ে আমরা সকলেই হেঁটে যাই সেখানেও এমন জিনিস থাকতে পারে যা তেমন করে নজরে পড়ে নি। সেরকম কিছু জিনিস নিয়ে এসেছি ক্লোজ-আপ ক্যামেরায়। ছিল কিন্তু নজরে পড়ে নি। ইনভেনশন নয় ডিসকভারি। 'নূতন করিয়া লহো আরবার চির পুরাতন মোরে।' তবে কিনা সকলেরই সাধ্যের সীমা আছে। আমিও তার ব্যতিক্রম নই। সেই সাধ্যসীমার মধ্যে থেকে আমার বিদ্যাসাগর অন্বেষণ।

দুটি জিনিস করি নি। এক, যা নিয়ে আমার কিছু বলার নেই তা নিয়ে লিখি নি। দুই, মাননীয়কে টেনে নামানোর যে ডিবাঙ্কিং জাতীয় গবেষণা-প্রদর্শনী আছে তা অবলম্বন করি নি। যা নেই তা দিয়ে যা আছে তাকে ঝাপসা করে দেবার একটা সুপ্রসিদ্ধ প্রক্রিয়া চালু আছে গবেষক মহলে। আমি কোনোদিনই তার পক্ষপাতী নই। এতে আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাস অকারণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যা তার কাছ থেকে পাবার আছে তা ভালো করে দেখে নেওয়াই ভালো। গড়ে তোলার ক্ষমতা কম হলে ভেঙে ফেলার আগ্রহ বেশি হয়। বীরত্ব প্রমাণিত হয় গড়ায়, ভাঙায় নয়। তৃতীয় একটি জিনিস বলার আছে, বিদ্যাসাগরকে বুঝতে হলে শুধু মস্তিষ্ক দিয়ে হয় না একটু অনুভব লাগে। মাঝে মাঝে প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে অনুভবকেও ব্যবহার করেছি।

শেষ কথা এই যে এ বই এক ঝোঁকে লেখা নয়। পঁচিশ তিরিশ বছর আগে লিখেছি এমন লেখাও এখানে সংকলিত। বিদ্যাসাগরের উপাধি প্রাপ্তিমূলক লেখাটি সেই লেখা। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার তাগিদ মেটাতে অনেক লেখাই লিখতে হয়েছে, তবে প্রতিটি লেখার পিছনে নিজস্ব তাগিদ ক্রিয়াশীল ছিল। উনিশ শতক—বাংলার রেনেসাঁস—এসব নিয়ে পড়তে পড়তে আমার একটা নিজস্ব বিদ্যাসাগর গড়ে উঠেছিল মনের মধ্যে। বিদ্যাসাগর উনিশ শতকে এসেছিলেন বাঙালি জীবনের একটা সাঙ্ঘাতিক (সঙ্ঘাত + ক্ষিক) সময়ে। তিনি তাঁর সময়ের মোকাবিলা করেছিলেন তাঁর মতো করে। তখনকার সময় আর এখনকার সময় এক নয়। কিন্তু কতকগুলি মৌলিক সংকট তখনও যা ছিল এখনও তাই আছে। বরং সেই সংকটের রঙ আরো ঘোর তমসাপূর্ণ। বিদ্যাসাগরের জীবন চর্যা ও জীবনকৃতি থেকে আমাদের অনেক কিছু পাওয়ার আছে। বিদ্যাসাগরকে আমি যেভাবে চিনেছি, জেনেছি তাই দিয়ে গড়ে তুলেছি এক একটি প্রসঙ্গ। কিছু তথ্য অনিবার্য প্রিয়জনের মতো ফিরে ফিরে এসেছে বই-এর নানা রচনায়। চেয়েছি, প্রিয়জনের মুখ বারবার দেখুক সকলে। এক এক প্রবন্ধের গবাক্ষ খুললে দেখা মিলবে এক এক বিদ্যাসাগরের

সঙ্গে। কোথাও তিনি বিত্তসাগর, কোথাও অশ্রুসাগর, কোথাও বস্ত্রসাগর, কোথাও বা দয়ার সাগর। বহুমাত্রিক একটা মানুষ। তেত্রিশ/চৌত্রিশটি লেখার সংকলন। এর একটি লেখাও যদি পাঠকের জানার বহুতল হর্ম্যের একটি নতুন কক্ষ খুলে দেয় জানব বই করা সার্থক।

সেই যে আমার জোড়া দেওয়া ছিন্ন দিনের খণ্ড আলোর মালা
সেই নিয়েই আজ সাজাই আমার থালা—

২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়

বোধি
বিএ ৭৫
নিউ টাউন
কলকাতা - ৭০০১৫৬
চলভাষ ৯৪৩৩৪৫৫৯৯২

সূচিপত্র

ঈশ্বরচন্দ্রের 'বিদ্যাসাগর' উপাধি	১৩
বিদ্যাসাগর যে হিউম্যানিস্ট ইতালীয় রেনেসাঁস স্বপ্নেও দেখে নি	১৮
বিদ্যাসাগরের জন্মবৃত্তান্ত বিচার	৩১
বিদ্যাসাগরের ভাল্লুক পেটানো ঠাকুরদা	৪০
বিদ্যাসাগর যে ঠাকুমার নাতি	৪৭
দশটাকা বেতনের ঠাকুরদাসের ছেলে	৫২
পাতুলের মাতুল রাধামোহন বিদ্যাভূষণ	৬০
রেলিঙ ভাঙার গল্প হিন্দু কলেজ বনাম সংস্কৃত কলেজ	৬৭
বিদ্যাসাগর ও ইয়ং বেঙ্গল	৮০
বিধবাবিবাহ বিদ্যাসাগর ও ইয়ং বেঙ্গল	১০৪
দুই বন্ধু বিদ্যাসাগর ও মাইকেল	১১৮
উনিশ শতকের অক্ষয় জুটি বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় দত্ত	১২১
বিদ্যাসাগর যে চাকরি পাননি	১৩৩
বিত্তসাগর বিদ্যাসাগর বা ঠাকুরদাসের সোনার হাঁস	১৪০
শিক্ষার সপ্তাশ্ব রথে এক সূর্য দেবতা	১৫০
বঙ্গীয় শিক্ষাঙ্গনে এক অসুর প্রতিভা বিদ্যাসাগর	১৭৩
বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের ট্র্যাজিক নায়ক	১৮৯
মাস্টার তৈরির ইস্কুল ও বিদ্যাসাগর	১৯৮
ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশন স্ট্রিটে বিদ্যাসাগর	২১৫

বিদ্যার আলয় স্থাপনে বিদ্যাসাগর ২২৯
বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ
বিদ্যাসাগরের আন্দোলন ও সরকারের আইন ২৫৮
সহবাস সম্মতি বিল ও বিদ্যাসাগর রায় বেকসুর খালাস ২৮০
বিদ্যাসাগর বস্ত্রসাগর ৩০৪
কে এসেছ তুমি ওগো দয়াময় ৩২১
রেনেসাঁসের আলোকে বিদ্যাসাগরের রসবোধ ও রসিকতা ৩৪১
আগাম অশ্রুপাত বিদ্যাসাগর ৩৫১
অশ্রুসাগর বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ বেথুন ৩৫৬
যে লেখা নিজের জন্য প্রভাবতী সম্ভাষণ ৩৬২
একটি উপেক্ষিত সাক্ষাৎকার বিদ্যাসাগর ও রেয়াজুদ্দীন আহমদ ৩৭৩
বিদ্যাসাগর মুসলিম পল্লি ও ফকিরের গান ৩৭৯
বানপ্রস্থে বিদ্যাসাগর ৩৮৭
বাঙালি জাতির অপদার্থতা
ডিরোজিও ও বিদ্যাসাগরের স্মৃতিরক্ষার দর্পণে ৪০১
সমকালের নামে একালের বিদ্যাসাগর বিচার ৪১৯

॥ ঈশ্বরচন্দ্রের 'বিদ্যাসাগর' উপাধি ॥

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মশতবার্ষিকী বহুদিন পেরিয়ে গেছে। তাঁর মৃত্যুশতবার্ষিকীও সমাসন্ন। সমকালে তিনি 'lonely promotheus'[১] হলেও উত্তরকালে তিনি বিস্মৃত হয়েছেন একথা কেউ বলবে না। বিদ্যাসাগর চর্চা আমাদের জীবনচর্যায় না হলেও গবেষণা স্তরে যথেষ্ট গভীরতা পেয়েছে। বহু বই-পত্র লেখা হয়েছে, এমনকি তার নামে রিসার্চ সেন্টারও[২] খোলা হয়েছে। কিন্তু একটি ছোটো অথচ গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান হয়নি। ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'বিদ্যাসাগর' নামেই সমধিক পরিচিত, 'বিদ্যাসাগর' তাঁর নাম নয়। প্রাপ্ত বা অর্জিত উপাধি। এই উপাধিটি কোথা থেকে পেয়েছিলেন, কি কারণে এবং কোন সময়—এর কোনো সদুত্তর আজ পর্যন্ত নেই।

শ্রীরাধারমণ মিত্র তাঁর 'কলিকাতায় বিদ্যাসাগর' প্রবন্ধে লিখেছেন—

> "এই কলেজে (সংস্কৃত কলেজ—মন্তব্য আমার) সর্বসাকুল্যে ১২ বছর ৫ মাস অধ্যয়নের পর ৪.১২.১৮৪১ তারিখে ঈশ্বরচন্দ্র কলেজের নিকট হইতে একটি ও অধ্যাপক বর্গের নিকট হইতে আর একটি মোট দুইখানি প্রশংসাপত্র এবং 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করেন।"[৩]

এই বক্তব্য পড়ে মনে হয়, সংস্কৃত কলেজে ঈশ্বরচন্দ্র বিভিন্ন শাস্ত্র কৃতিত্বের সঙ্গে পাঠ শেষ করার সৌজন্যে কলেজ কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকদের কাছ থেকে ১৮৪১ সালে 'বিদ্যাসাগর' উপাধিটি পেয়েছিলেন। কিন্তু এই বক্তব্য ঠিক নয়।

শ্রীবিনয় ঘোষ তাঁর 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' নামক প্রামাণিক গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দেখিয়েছেন, ১৮৩৯ সালের এপ্রিল মাসে হিন্দু ল কমিটির পরীক্ষা দিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। এই পরীক্ষায় পাশ করলে আদালতে জজ পণ্ডিতের চাকরি পাওয়া যেত। এই সময় তাঁকে যে সার্টিফিকেট দেওয়া হয় তাতে লেখা হয়—

> Issur Chandra Vidyasagar was found and declared to be qualified by his eminent knowledge of the Hindu Law to hold the Office of Hindoo Law Officer in any of the established courts of judicature.

"১৮৩৯ সালের মে মাসের এই প্রশংসা পত্রে দেখা যায়, তাঁর নামের শেষে 'বিদ্যাসাগর' উপাধিটি ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং ১৮৪১ সালে কলেজের পাঠ শেষ হবার পর অধ্যাপকরা মিলিত হয়ে তাঁকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি দিয়েছিলেন এ ধারণা প্রচলিত হলেও ঠিক নয়। 'বিদ্যাসাগর' উপাধি কলেজের অধ্যয়ন শেষ হবার আগেই তিনি পেয়েছিলেন। অন্তত ১৮৩৯ সালের মে মাসের আগে পেয়েছিলেন।"[৪]

শ্রীঅমলেশ ত্রিপাঠী তাঁর "Vidyasagar : The Traditional Moderniser"[৫] — গ্রন্থে এ বিষয়ে বাড়তি কোনো আলোকপাত করতে পারেননি। তিনি শ্রীবিনয় ঘোষের বক্তব্যেরই পুনরুচ্চারণ করেছেন—

> Before he got his college leaving certificate on 4 December 1841, he had passed the Hindu Law Committee Examination. The certificate he obtained for passing the latter (16th May 1839) mentions for the first time the title 'Vidyasagar' which has almost replaced his name today.*

বিদ্যাসাগর রিসার্চ সেন্টারের প্রধান শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী[৬] একটি ব্যক্তিগত পত্রে (আমাকে লেখা) জানিয়েছেন, তিনি অনুমান করেন—১৮৩৯ সালে স্মৃতিশাস্ত্রের কৃতী ছাত্র হিসেবে ঈশ্বরচন্দ্র 'বিদ্যাসাগর' উপাধি পেয়ে থাকবেন। বলাবাহুল্য, অনুমানটি তথ্য সমর্থিত নয়।

'বিদ্যাসাগর' উপাধি প্রাপ্তির এই সমস্যাটি ভেদ করতে সাহায্য করতে পারে শ্রীগোপিকামোহন ভট্টাচার্য প্রণীত 'কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস' (২য় খণ্ড) গ্রন্থটি। মহেশচন্দ্রের 'ন্যায়রত্ন' উপাধি-প্রাপ্তি সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন—

> অবশ্য তখন সংস্কৃত কলেজ হইতেও 'ন্যায়রত্ন' উপাধি অর্পণ করা হইত। সেকালে বিভিন্ন বিভাগ হইতে ছাত্রগণ যে সকল উপাধি লাভ করিতেন তাহার তালিকা নিম্নে উদ্ধৃত হইল
>
> সাধারণ সাহিত্য বিদ্যারত্ন, বিদ্যালঙ্কার, বিদ্যাসাগর, বিদ্যাভূষণ, বিদ্যাবিনোদ, বিদ্যানিধি, কবিরত্ন।
>
> হিন্দু দর্শন ন্যায়রত্ন, ন্যায়ভূষণ, ন্যায়ালঙ্কার, তর্করত্ন, তর্কভূষণ, তর্কালঙ্কার, তর্কচূড়ামণি,. তর্কবাগীশ, তর্কবাচস্পতি, তর্কশিরোমণি, বেদান্তবাগীশ, তর্কপঞ্চানন, তর্কসিদ্ধান্ত, ন্যায়পঞ্চানন।
>
> স্মৃতিশাস্ত্র স্মৃতিরত্ন, স্মৃতিচূড়ামণি, স্মৃতিশিরোমণি, স্মৃতিভূষণ, স্মৃতিকণ্ঠ।
>
> বেদ বেদরত্ন, বেদকণ্ঠ।*

* Letter from the Principal. Sanscrit College to A.W. Croft. D.P.I on the 6th February 1878 (Sanscrit College Records)

> কৃতি ছাত্রগণ ইচ্ছামতো উপাধি বাছিয়া লইতেন। ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দ হইতে সংস্কৃত কলেজে উক্ত উপাধি অর্পণের রীতি প্রবর্তিত হয়। পূর্বে উপাধি পত্রে স্বাক্ষর করিতেন 'কাউন্সিল অফ এডুকেশন'-এর সভাপতি ও সভ্যগণ পরে উক্ত কাউন্সিল বিলুপ্ত হইলে উপাধি পত্রে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ও ডিরেকটর অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন স্বাক্ষর করিতেন।*[৮]

শ্রীগোপিকামোহন ভট্টাচার্য প্রদত্ত এই তথ্য সঠিক হলে এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে ঈশ্বরচন্দ্রের 'বিদ্যাসাগর' উপাধি প্রাপ্তির রহস্যটি ভেদ করা যায়।

ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য শ্রেণিতে ১৮৩৩ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ১৮৩৫ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত মোট দুবছর প্রখ্যাত অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের কাছে পড়েছিলেন।[৯] সাহিত্যশ্রেণির দ্বিতীয় বার্ষিক বা শেষ পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং পুরস্কার পান। তাহলে বলা যায় সাহিত্য শ্রেণির কৃতি ছাত্র হিসাবে ১৮৩৫ সালের জানুয়ারি মাসে ঈশ্বরচন্দ্র 'বিদ্যাসাগর' উপাধি অর্জন করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৫ বছর। গোপিকামোহন ভট্টাচার্য বলেছেন ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে সংস্কৃত কলেজে উক্ত উপাধিটি অর্জনের রীতি প্রবর্তিত হয়। কৃতি ছাত্র ইচ্ছামতো উপাধি বেছে নিত। সুতরাং বলা যায়, বিশেষভাবে 'বিদ্যাসাগর' উপাধিটি তিনি নিজেই বেছে নিয়েছিলেন। উপাধি নির্বাচনের ব্যাপারে তাঁর শিক্ষক জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের কিছু ভূমিকা থাকলেও থাকতে পারে।

এখন দু একটি প্রশ্ন খতিয়ে দেখার আছে। প্রথমত গোপিকামোহন ভট্টাচার্য লিখেছেন সেই উপাধিপত্র ছাত্রদের অর্পণ করা হত। তাতে স্বাক্ষর করতেন, প্রথমদিকে কাউন্সিলের সভাপতি ও সভ্যগণ, পরে কাউন্সিল বিলুপ্ত হলে, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ও ডি. পি. আই অর্থাৎ এটি ছিল রীতিমতো স্বাক্ষরিত সরকারি উপাধি। রীতিমতো স্বাক্ষরিত সরকারি উপাধি হওয়া সত্ত্বেও 'বিদ্যাসাগর' উপাধি নিয়ে গবেষক মহলে দীর্ঘকালীন অজ্ঞতার কারণ বোঝা যায় না। সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন সেই উপাধি পত্রটিই বা গেল কোথা?

দ্বিতীয়ত বিদ্যাসাগরের উপাধিপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন কে বা কারা? সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ও ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের পক্ষে তো নয়ই 'কাউন্সিল অফ এডুকেশনে'র সভাপতি ও সভ্যগণের পক্ষেও 'বিদ্যাসাগর' উপাধিপত্রে স্বাক্ষর করা সম্ভব ছিল না। কেননা শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস' ১ম খণ্ডে জানিয়েছেন—

'১৮২৩ সনের জুলাই মাসে জেনারেল কমিটি অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার বিলোপ সাধন করিয়া ১৮৪২ সনের ১০ জানুয়ারি তারিখের প্রস্তাব অনুযায়ী কাউন্সিল অফ এডুকেশন বা শিক্ষাসংসদ গঠিত হয়। আবার ১৮৫৫ সনের ২৬ জানুয়ারি

কাউন্সিল অব এডুকেশনের পরিবর্তে ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন্স পদের সৃষ্টি হয়।"[১০]

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহের 'ইতিহাস গবেষণা'[১১] গ্রন্থে এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়।

১৮৩৫ সালে সংস্কৃত কলেজের হর্তাকর্তা ছিল 'জেনারেল কমিটি অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন'। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ প্রথম সৃষ্টি হয় ১৮৫১ সালে। বিশেষত বিদ্যাসাগরই সংস্কৃত কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ (২২ জানুয়ারি ১৮৫১)[১২] সুতরাং ১৮৩৫ সালে প্রদত্ত সরকারি উপাধিপত্রে স্বাক্ষর করার মালিক জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের পক্ষে সংস্কৃত কলেজের তৎকালীন সেক্রেটারি ক্যাপ্টেন এ. ট্রয়ার কারণ ক্যাপ্টেন এ ট্রয়ার সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারী হিসেবে কাজ করেছিলেন '১৮৩২ সনের মে মাসের মধ্য ভাগ হইতে ১৮৩৫ সনের ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।'[১৩] (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)। তারপর সেক্রেটারী হন রামকমল সেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের 'বিদ্যাসাগর' উপাধি প্রাপ্তি সম্পর্কে বিনয় ঘোষ তথ্য ভিত্তিক একটি সন্দেহ উত্থাপন করে গিয়েছিলেন। শ্রীগোপিকামোহন ভট্টাচার্য প্রদত্ত তথ্য-সূত্র ধরে একটি সুস্পষ্ট সমাধান এই প্রবন্ধে দেবার চেষ্টা করলাম। যাঁদের অধিকার ও সাধ্য আছে তারা যেন 'First hand source' দিয়ে আমার ব্যবহৃত তথ্য ও সিদ্ধান্তটি যাচাই করে দেখেন। 'First hand source'-এর কষ্টি পাথরে বক্তব্যটি সত্যতা নাকচ না হলে ঈশ্বরচন্দ্রের 'বিদ্যাসাগর' উপাধি প্রাপ্তি নিয়ে একটি দীর্ঘকালীন অজ্ঞতার অবসান হবে।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৯৪ বর্ষ প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৯৯৫
সম্পাদক নির্মলেন্দু ভৌমিক

উল্লেখপঞ্জি

১. A. Tripathi—*Vidyasagar : The Traditional Moderniser*.
২. বিদ্যাসাগর রিসার্চ সেন্টার, কলিকাতা।
৩. রাধারমণ মিত্র—কলিকাতায় বিদ্যাসাগর (*ঐতিহাসিক* ২। জুলাই ১৯৭৬)।
৪. বিনয় ঘোষ—*বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ*—২য় খণ্ড।
৫. A. Tripathi—*Vidyasagar : The Traditional Moderniser*, p.18
৬. 'বিদ্যাসাগর' উপাধি প্রাপ্তি বিষয়ে প্রশ্ন করে বিদ্যাসাগর রিসার্চ সেন্টারের প্রধান, বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বেশ কয়েকটি গ্রন্থের লেখক, শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারীকে আমি একটি চিঠি লিখি ; তার উত্তরে তিনি আমাকে একটি ব্যক্তিগত পত্রে তাঁর ওই অনুমানের কথা জানান।

৭. গোপিকামোহন ভট্টাচার্য—*কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস* (২য় খণ্ড) পৃ. ৩৭।
৮. বিনয় ঘোষ—*বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ* (২য় খণ্ড)।
৯. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—*কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস* (১ম খণ্ড) পৃ. ৫৯।
১০. *তদেব*।
১১. নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ—'হিন্দু কলেজ', *ইতিহাস গবেষণা* (পৃ. ১৩৮) "১৯৪২ সালে স্যার এডওয়ার্ড রায়ান ইউরোপে ফিরে গেলে সরকার জেনারেল কমিটির পরিবর্তে শিক্ষা পরিষদ (Council of Education) গঠন করেন এবং শিক্ষা সংক্রান্ত সবরকম কাজকর্ম ও আর্থিক দায় দায়িত্বের ভার সরাসরি গ্রহণ করেন।"
১২. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—*কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস* (১ম খণ্ড), পৃ. ৫১।
১৩. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—*ঐ*, পৃ. ৪৪।